রবীন্দ্রনাথের

# শেষের কবিতা

# কবিগুরুর কথা

আজ মনে পড়ে যে দিন কবিগুরু "শেষের কবিতা" লিখে নিজে পড়ে শোনালেন। সেদিন রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে এই বইএর উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ নিয়ে নানারকমের আলোচনা চলতে থাকে। প্রত্যেকেই এক একটা থিওরী বা তত্ত্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ গড়ে তোলেন এবং মজা হলো, কারুর ব্যাখ্যার সংগে কারুর ব্যাখ্যা মেলেনা। তখন আমরা একদিন স্বয়ং কবিগুরুকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

তিনি হেসে বললেন, "আমার একটা দুর্ভাগ্য আছে, যেখানে আমার হাঁটু জল, লোকে সেখানে ডুব জল ধরে নেয়। ব্যাখ্যা বা তত্ত্বের কথা বাদ দিয়ে, আমার অনুরোধ "শেষের কবিতা'কে তোমরা একটা সোজা গল্প হিসাবে দেখো।"।

বহুদিন পরে আজ যখন "শেষের কবিতা" ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে, কবিগুরুর এই কথাটি দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

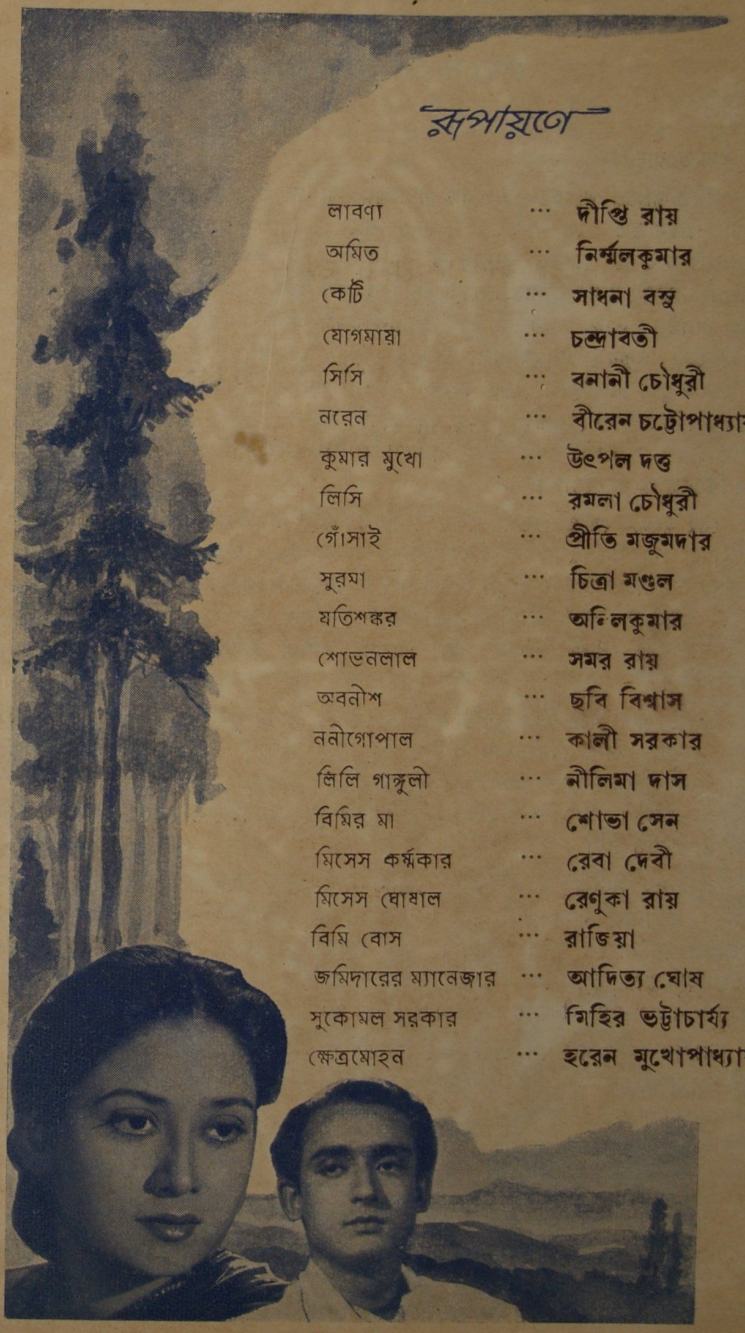

## রূপায়ণে

| | | |
|---|---|---|
| লাবণ্য | ... | দীপ্তি রায় |
| অমিত | ... | নির্ম্মলকুমার |
| কেটি | ... | সাধনা বসু |
| যোগমায়া | ... | চন্দ্রাবতী |
| সিসি | ... | বনানী চৌধুরী |
| নরেন | ... | বীরেন চট্টোপাধ্যায় |
| কুমার মুখো | ... | উৎপল দত্ত |
| লিসি | ... | রমলা চৌধুরী |
| গোঁসাই | ... | প্রীতি মজুমদার |
| সুরমা | ... | চিত্রা মণ্ডল |
| যতিশঙ্কর | ... | অনিলকুমার |
| শোভনলাল | ... | সমর রায় |
| অবনীশ | ... | ছবি বিশ্বাস |
| ননীগোপাল | ... | কালী সরকার |
| লিলি গাঙ্গুলী | ... | নীলিমা দাস |
| বিমির মা | ... | শোভা সেন |
| মিসেস কর্ম্মকার | ... | রেবা দেবী |
| মিসেস ঘোষাল | ... | রেণুকা রায় |
| বিমি বোস | ... | রাজিয়া |
| জমিদারের ম্যানেজার | ... | আদিত্য ঘোষ |
| সুকোমল সরকার | ... | গিহির ভট্টাচার্য্য |
| ক্ষেত্রমোহন | ... | হরেন মুখোপাধ্যায় |

# শেষের কবিতা

অমিত রায়।

অমিত রায়ের পরিচয়—ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সবচেয়ে ওপরের থাকের লোক—তাই নামটা পরিবর্ত্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিট রায়ে। বিলেত-ফেরত ব্যারিষ্টার, কিন্তু আদালতে যাওয়ার চেয়েও আদালতে না যাওয়াতেই তার উৎসাহ বেশী। কারণ বাপ যে পরিমাণ টাকা জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই তার আগ্রহ জীবিকায় নয়—তার সমস্ত আগ্রহ হল জীবনের রসাস্বাদনে। অফুরন্ত তার যৌবনের উৎসাহ। যৌবনের জোরেই বেহিসেবী—উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাহিরের দিকে। কিন্তু তার এই বেহিসেবী ছুটে চলার মধ্যে আছে একটা প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্য। তার সব কাজে, সব কথায়—সে একটি কথাই প্রমাণ করতে চায়—সে অসাধারণ। তাই সাধারণ লোকে যাকে খুসী হ'য়ে প্রশংসা করে—সে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

সেই জন্যেই সে প্রচণ্ডভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত খ্যাতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করলে এবং বালীগঞ্জের সাহিত্যসভায় সভাপতিরূপে ঘোষণা করল ডেমোক্রেসীর যুগে রবীন্দ্রনাথের উচিত তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আসন কোনো নতুন কবির জন্যে খালি করে যাওয়া। আমরা জানি সে নতুন কবি হল স্বয়ং অমিত রায়—তবে সে কথাটা সে আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে গোপন রেখে নিজের ছায়ার স্বরূপ সৃষ্টি করল নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে।

উল্‌টো কথা বলা আর উল্‌টো কাজ করায় ওর একটা দুরন্ত প্রতিভা। যে রমণীর গলা বেসুরো—তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে। যখন-তখন মোটরে চড়ে অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসে—এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে। ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়ীতে ও-বাড়ীতে ফেলে আসছে আর ফিরিয়ে আনছে না।

মেয়েদের সম্বন্ধে ওর উৎসাহের অভাব নেই—কিন্তু সত্যিকারের কোন আগ্রহই নেই। সে নিজে অসাধারণ, তাই মনে মনে সে যে-অপরূপা নারীর মূর্তি গড়ে তুলেছিল সে নারীও হবে অনন্যা। এই ছিল তার লক্ষ্য এবং যে কোন মেয়ের সংগে যখনি তার দেখা হত, সে তার মধ্যে তার সেই অনন্যাকেই খোঁজ করত। কিন্তু কোন পরিচিতার মধ্যেই তার সেই অন্তরের অনন্যার মূর্তি সে দেখতে পেত না।

যেদিন অক্সফোর্ডে সে প্রথম কেটি মিত্তিরকে দেখেছিল—কেটি মিত্তিরের অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে—কেটির কণ্ঠে সংগীত শুনে—সে মনে করেছিল, বুঝি তার অনন্যার দেখা সে এতদিনে পেল। কিন্তু অল্প দিনের অন্তরঙ্গতায় সে বুঝল সে ভুল করেছে। তার মনের পরিধি থেকে কেটি সরে গেল। এল আরও বহু মেয়ে—বিমি বোস, লিলি গাঙ্গুলী, প্রজাপতির মত তারাও এল—উড়ে চলে গেল।

অবশেষে একদিন বিরক্ত হয়ে তার দুই বোন সিসি আর লিসি তাকে শাসায়—'অমি, চিরকাল তোমাকে এমনি ছায়ার পেছনেই ছুটে বেড়াতে হবে।' কিন্তু অমিত সে কথা স্বীকার করে না। সে জানে এই পৃথিবীর মধ্যে সে যে অপরূপা অনন্যাকে খোঁজ করছে,—একদিন অকস্মাৎ শুভলগ্নে তার দেখা সে পাবেই·····

এবং একদিন অকস্মাৎ পথের মাঝখানে সে তার সেই অনন্যার দেখা সত্যসত্যই পেয়ে গেল। সিসি আর লিসি এবং বন্ধুবান্ধবদের সংগ ত্যাগ করে যে দিন সে একা নির্জনতার খোঁজে শিলং পাহাড়ে এল, সেদিন হঠাৎ এক পথের বাঁকে তার মোটরের সংগে আর এক মোটরের হ'ল সংঘর্ষ। ক্ষমা চাইবার জন্যে লজ্জিত হয়ে মোটর থেকে নামতেই দেখে অপর গাড়ী থেকে নামল এক অপরূপা তরুণী। অমিতের অন্তর বিস্ময়ে ভরে উঠল। মনে মনে বললে: তুমি অনন্যা।

তারপর সুরু হল শিলং পাহাড়ের মেঘ মেদুর ছায়ায় এক অপরূপ মন-জানা-জানির খেলা। অকস্মাৎ পথের দুর্য্যোগে যার সংগে দেখা হয়েছিল—ক্রমশঃ পরিচয়ের ঘনিষ্টতায় অমিত জানল তার নাম লাবণ্য এবং লাবণ্যের পরিচয়ের সংগে সংগে সে পরিচিত হল আর এক অপরূপা নারীর সংগে—যোগমায়া। মাসিমা বলে অমিত তাঁকে প্রণাম করলে।

লাবণ্যকে ডেকে অমিত বলে: তোমাকে আমি ডাকব বন্যা। তুমি আমাকে দাও নতুন নাম।

লাবণ্য বলে: আমি তোমাকে ডাকব মিতা।

শিলং পাহাড়ের নির্জনতা ভরে ওঠে বন্যা আর মিতার অন্তরঙ্গ আলাপে। দূর থেকে লক্ষ্য করেন যোগমায়া। তাঁর মাতৃ-অন্তরে তিনি উপলব্ধি করেন লাবণ্য আর অমিত যেন পরস্পর পরস্পরের জন্যই জন্মেছে। বন্যা আর মিতার পরিচয় যখন অন্তরঙ্গতায় নিবিড় হয়ে উঠেছে, সেই সময় একদিন যোগমায়া জোর করে লাবণ্যর হাত তুলে দিলেন অমিতের হাতে। কিন্তু লাবণ্য জানত যে অমিত বিয়ে করবার লোক নয়—তার মনে আছে এক দুরন্ত রুচির তৃষা। বিয়েটাকে সে মনে করে 'ভালগার'।

মাতৃস্নেহের ব্যস্ততায় যোগমায়া বিবাহের দিন পর্য্যন্ত করলেন স্থির। এমন সময় দূর অতীত কাল থেকে উড়ে এল বিস্মৃত সুবাসের মত স্মৃতির একটি শুকনো পাতা। একটি ছেলের কাহিনী। ছেলেটির নাম শোভনলাল। সেই বিস্মৃত দিনের কাহিনী অকস্মাৎ এসে দাঁড়াল লাবণ্য ও অমিতের মাঝখানে। এতদিন সেই স্মৃতি সুপ্ত ছিল লাবণ্যের অবচেতন মনে। শোভনলাল ছিল তার সতীর্থ—তার পিতার

একান্ত প্রিয় ছাত্র। একদিন জীবনের প্রথম জাগরণ-লগ্নে সে বিদ্যার মোহে শোভনলালকে করেছিল অপমান। ভুল বুঝে তাকে রূঢ় ভাবে দিয়েছিল তাড়িয়ে তার বাড়ী থেকে। স্বল্পভাষী শোভনলাল সেদিন সে আঘাতের কোন প্রতিবাদ করেনি। নিঃশব্দে সে বেরিয়ে পড়েছিল পথে—পথ চল্‌তে চল্‌তে ক্ষইয়ে ফেলতে লাবণ্যর স্মৃতি। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে ভারতের পুরাতন ভগ্নাবশেষ খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়ে শিলং পাহাড়ে—এসে পড়ে আবার লাবণ্যর জীবনে।

অমিত আর লাবণ্যর নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে জেগে উঠল তরংগ-বিক্ষোভ। এধারে একদিন যে কেটিকে অমিত এড়িয়ে চলত এবং মনে করত তার জীবন থেকে চলে গিয়েছে কেটির প্রভাব—এবং যে কেটিও আত্ম-ধ্বংসের উন্মাদনায় নিজেকে বাইরে থেকে পাঁচজনের মধ্যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল—অমিত আর লাবণ্যর বিয়ের সংবাদে বান্ধবী সিসিকে সংগে নিয়ে শিলং-এ এসে উপস্থিত হলো—নিজের চোখে দেখবার জন্যে সংবাদটা সত্য কি না। তার কারণ সমস্ত আত্মধ্বংসের বিক্ষোভের মধ্যে নিজের হাতে তৈরী করা সমস্ত এনামেলের ভেতর কেটি চিরন্তনী নারীর মত অসীম বিশ্বাসে লুকিয়ে রেখেছিল অমিতের প্রতি তার একান্ত প্রেম। তাই শিলং পাহাড়ের ছায়ায় ঘনিয়ে উঠল চারটি অপরূপ নরনারীর জীবনের ও মিলনের অপূর্ব্ব নাটকীয় সংঘর্ষ।

* * * *

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ প্রতিভায় এই নাটকের পরিণতিকে যে ভাবে সত্য করে ফুটিয়ে তুলেছেন—ছবির পর্দায় আমরা যথাযথ তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনু-সরণ করেছি এবং শুধু এইটুকুই আপনাদের সামনে নিবেদন করতে চাই—এই নাটকীয় পরিণতির মধ্যে দিয়ে কবিগুরু যে কথাটি আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন সে হল ঃ

প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে দুটি করে মানুষ আছে—একটি মানুষ চায় নীড় বাঁধতে আর একটি মানুষ চায় বন্ধনহীন আকাশে বিচরণ করতে। এই দুটি মানুষকে নিয়েই মানুষের যত রোমান্স। অমিত রায় বলেছিল—আমি রোমান্সের পরমহংস—অর্থাৎ আমি নীড়ও চাই আকাশও চাই। কবিগুরু তাই এই নাটকের পরিণতিতে সেই নীড় আর আকাশকে এক সংগে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। লাবণ্যর প্রেম হ'ল আকাশ—কেটি অথবা কেতকীর প্রেম হল নীড়।

এই অপরূপ নাটক কবিগুরু শেষ করেছেন অমর একটি কবিতায়—সেই কবিতাই হল 'শেষের কবিতা'। এই শেষের কবিতা হল অমিতের কাছে লাবণ্যর বিদায়—কিন্তু কবিগুরু দেখিয়েছেন এ বিদায়ের মধ্যে নেই বিচ্ছেদের বেদনা, কারণ যে ভালবাসায় অমিত লাবণ্য আর কেতকী পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে পেল—সে ভালবাসা ছিল বৈষ্ণবের পরিভাষায় দেহাতীত অমর প্রেম। এই অমর প্রেমের বাণী হ'ল 'শেষের কবিতা'র বাণী—

"তোমারে যা দিয়েছিনু
সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়
………………হে বন্ধু বিদায়।"

# সঙ্গীত

( ১ )

আমার পরাণ যাহা চায়—তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো॥
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়-মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো॥
আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো॥

( ২ )

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে।
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও হৃদয়রতন-আশে।
ফিরে এসো, ফিরে এসো ; বন মোদিত ফুলবাসে।
আজ বিরহ রজনী ; ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে॥

( ৩ )

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে॥
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে॥
আসন আমায় পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥

( ৪ )

হার মানালে গো ভাঙ্গিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা, ম্লান দীপের থালা—
হলো খান্ খান্—হায়……হায়!
হার মানালে গো ভাঙ্গিলে অভিমান।

প্রদীপ প্রোডাক্‌শান্সের

শুভকার্য্য

রবীন্দ্রনাথের

# শেষের কবিতা

পরিচালনা—**মধু বসু**

চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও মধু বসু

আলোকচিত্র—জি কে মেহ্‌তা

শব্দানুলেখন—লোকেন বসু

সম্পাদনা—শ্যাম দাস ও শিব ভট্টাচার্য্য

শিল্পনির্দ্দেশ—কার্ত্তিক বসু

প্রধান কর্ম্মসচিব—মনিলাল শ্রীবাস্তব

ব্যবস্থাপনা—কল্যান গুপ্ত

রূপসজ্জা—ত্রিলোচন পাল ও দেবী হালদার

তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণ—হরেন গাঙ্গুলী

স্থির-চিত্র—ষ্টীল ফটো সার্ভিস

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিচালনা—অনাদি কুমার দস্তিদার

আবহ সঙ্গীত—কালিপদ সেন

সঙ্গীত অনুসৃতি—সুর ও শ্রী

ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে আর-সি-এ ফটোফোন শব্দযন্ত্রে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিমিটেডে পরিস্ফুটিত

**সহকারীবৃন্দ ঃ**

পরিচালনায়—শিব ভট্টাচার্য্য

আলোকচিত্রে—সর্ব্বেশ্বর শেঠ ও গোরা মল্লিক

শব্দানুলেখনে—তপন ঘোষ

সম্পাদনায়—রাম সাহু

কারুশিল্পে—বেনারসী শর্ম্মা

পরিবেশক ঃ **প্রভা পিকচার্স**

প্রভা পিকচার্স, ৫৬, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।